আমিই সেই মেয়ে

সুশান্ত দাস

আমিই সেই মেয়ে

সুশান্ত দাস

নাথ পাবলিশিং
৭৩ মহাত্মা গান্ধী রোড ❑ কলকাতা ৭০০০০৯

Amii Sei Meye
by
Sushanta Das
Rs. 40.00

Published by :
Samir Kumar Nath
Nath Publishing
73 Mahatma Gandhi Road
Kolkata 700 009

প্রথম প্রকাশ
জানুয়ারী ২০০৯
মাঘ ১৪১৫

প্রকাশক
সমীরকুমার নাথ
নাথ পাবলিশিং
৭৩ মহাত্মা গান্ধী রোড
কলকাতা-৭০০ ০০৯

অক্ষরবিন্যাস
তনুশ্রী প্রিন্টার্স
২১বি রাধানাথ বোস লেন
কলকাতা-৭০০ ০০৬

মুদ্রক
অজন্তা প্রিন্টার্স
৬১ সূর্য সেন স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০ ০০৯

ISBN : 81-8093-092-0

সূচীপত্র

আমিই সেই মেয়ে	৯
আকাশের শৈশব	১৩
চলে যাবি?	১৬
আমার বোনটা	১৮
শায়ন সুদেষ্ণা	২০
ছেলেটা	২২
জীবন সংগ্রাম	২৪
রুটি দাও	২৭
কাঁটাতার	২৯.
চাঁদ	৩১
চাঁদের পরী	৩২
শুনছো	৩৪
প্রথমার সাহিত্য	৩৫
তুমি না থাকলে	৩৭
পানসে প্রেম	৩৮
তুমি চাইলে	৩৯
তোমাকে নয়	৪০
নীল নির্জনে	৪১
মায়েরা	৪২
দাদু ঠাকুমা	৪৩
আমি নেই	৪৫
তুমি এসো	৪৬
একটি স্টেশন	৪৭
যদি ফিরে পেতাম	৪৮
শীতের সকালে	৪৯
শীত মানে কি?	৫০
চলো	৫১
আবির	৫২
বসন্ত বিদায়	৫৩
বিকেলবেলা	৫৪
খোলা রাজপথ	৫৫
তুমি এসেছো, বেশ করেছো	৫৬
একলা সওয়ার	৫৭
অসম্পূর্ণ কবিতা	৫৮
আমার পেন	৬০
চোরাবালি	৬২
পথ	৬৩
অঙ্গীকার	৬৪

আমিই সেই মেয়ে

হ্যাঁ আমিই সেই মেয়ে।
মায়ের পেটেতেই যে ভ্রুণটাকে মেরে ফেলতে চেয়েছিলে,
একজন মায়ের পেটে
একটি ছেলে ভ্রুণের আশায় দিন গুণছিলে বুঝি?
আমিই সেই মায়েদের মেয়ে
আমিই সেই মেয়ে।

ভ্রুণটাকে মারতে পারনি তোমরা
তবু মেরেছো আর একটি মেয়েকেই
আমার মায়েদের তলপেটে এখনো যন্ত্রণা হয়,
এখনো পিঠে পোড়া দাগের চিহ্ন বর্তমান,
তবু মাতো বাবার সংসারেই
স্বামী, পুত্র, কন্যা নিয়ে আমার বাবার সংসারেই আছে।

হ্যাঁ আমিই সেই মেয়ে।
আমি পাড়ার স্কুলে পড়ি, খানপুর গার্লস স্কুল
ভাইয়ের সাউথ পয়েন্ট স্কুল।
আমি মায়ের সাথে হেঁটে স্কুলে যাই
দশ মিনিট হাঁটা পথ,
ভাই বাবার সাথে বাবার গাড়ীতে রোজ।

হ্যাঁ আমিই সেই মেয়ে।
রোজ রাতে একসাথে ভাত খাই আমরা
প্রথমে বাবা-ভাই খায়
মা ভাত বাড়ে, আমি জল দিই,
পেঁয়াজ কেটে দিই, লঙ্কা লেবু এসব
তারপর আমি আর মা।

মা বলে "মেয়েদের শেষে খেতে হয়"
মানে শেষ পাতে
মানে শেষ ভাত, শেষ ডাল, শেষ ঝোল
শেষ মাছ আধাআধি
মা আর আমি।

হ্যাঁ হ্যাঁ আমিই সেই মেয়ে।
ড্রইং ক্লাসে যায় ভাই
দাবার স্কুল, ক্রিকেট ক্লাব, সুইমিং পুল
সব সব ভাইয়ের কোটায়।
ওকে তো দাঁড়াতে হবে
হতে হবে চৌকস অলরাউণ্ডার।
আমি পুতুল খেলি
মা শেখায় কিভাবে পুতুল বিয়ে দিতে হয়
পুতুলের নতুন সংসারে কারা কারা থাকে
তাদের জন্যে কি কি রান্নার মেনু হয়।
ঘর ঝাঁট দেওয়া, বিছানা টান টান করে পাতা,
মশারী টাঙানো, ওয়াশিং মেশিন চালানো
আমার একস্ট্রা কারিকুলার অ্যাকটিভিটিস!

আমিই সেই মেয়ে।
ভাই ডাক্তারী পড়ে এন.আর.এসে
আমি ইতিহাসে অনার্স এন্ড্রুজে
ভাই ফার্স্ট ক্লাস ক্রিকেট খেলে,
দাবার কলেজ চ্যাম্পিয়ান,
আমি রোদে বসে নিশ্চিন্তে সোয়েটার বুনি
আমি গান গাই মায়ের ভাঙা হারমোনিয়ামে
ধুলো ঝেড়ে কাছে টেনে নিয়েছি একদিন।

এরপর এলো বড়দিন
সব মেয়েদের বড়দিন।
বাবার সংসার ছেড়ে
একমুঠো চাল দরজায় ছুঁড়ে দিয়ে

বাবার সব ঋণ শোধ করে
বাবার পদবি ঝেড়ে ফেলে দিয়ে চললাম।
একলা আমি
যেন গোটা সংসারে একলা আমি।
এই অচেনা পৃথিবীতে
যেখানে একটি মানুষও আমার চেনা নয়
কখনো বাড়ী দূরে থাক
ঐ পাড়া ঐ পরিবেশ
ঐ অঞ্চলের নাম পর্যন্ত শুনিনি
সেখানে আজীবনের বনবাস।
যে মানুষটার সাথে সব ছেড়েছুড়ে চলে এলাম
সে গিয়ে পারবে থাকতে অন্তত একটি মাস
আমার বাবার সংসারে এভাবে?
এদের খাবার দাবার পোশাক আশাক
চলন বলন আচার আচরন আনন্দ দুঃখ
সবকিছু সবকিছু একদম অচেনা
একদম আলাদা।

আমিই সেই মেয়ে।
স্বামীর সংসারকে নিজের ভেবে
আবার শূন্য থেকে শুরু করি
তবু এতটুকু কথা কাটাকাটিতেই
বাপের বাড়ী প্রসঙ্গ এসে যায়
অথচ বাবার বাড়ী গেলেও
ধীরে ধীরে অচেনা লাগে বাপের বাড়ীকেও।

আমিই সেই মেয়ে।
তবুও আমি দশমাস দশদিন পেটে ধরি
রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, সুকান্তকে
কোলেপিঠে করে বড় করি
নেহেরু, গান্ধী, নেতাজীকে।
আমাকে নিয়ে পাশা খেলা যায়
জুয়ায় বাজি ধরা যায়

ভরা সভায় বস্ত্রহরণ করা যায়
আমাকে ভাগাভাগিও করা যায়।

আমিই সেই মেয়ে।
যাকে মন্দিরে প্রতিস্থাপন করো তোমরা
সকাল বিকেল পুরোহিত দিয়ে পূজো করো
আর মা মা ডাকে চোখে জল এসে যায়।
আমিই সেই মেয়ে
যার হাতে অসুর সংহার হয়
যার হয় পাতাল প্রবেশও।
আমিই সেই ভারতের মেয়ে
আবার আমি ভারতমাতাও।

আকাশের শৈশব

আকাশ নামটি রেখেছিলো ওর মা
বড় হয়ে মা বাবার জীবনে
মস্ত ছাতার নামটি হবে আকাশ।

ছ বছরের ছোট্ট আকাশ মায়ের সাথে পার্কে যায়
দৌড়ে বেড়ায় গোটা পাড়ায় মায়ের হাত ছেড়ে।
আকাশ ফিরে আয় বাবা
আমি এত ছুটতে পারিনা তোর সাথে।
আকাশের থেমে থাকার কথাও নয় এ বয়সে।
আকাশ স্কুলে যায় মায়ের পায়ে পায়ে।

এই পর্যন্ত সমস্ত চলছিলো একেবারে প্রকৃতির নিয়মে,
হঠাৎ এক উদ্দাম ঝড়
আকাশের শরীর মন আত্মাকে
একেবারে ক্ষতবিক্ষত করে দিয়ে গেলো।
মায়ের হাতের স্পর্শ আর পাবে না আকাশ
সবাই বলে ঐ আকাশের বুকে একটি তারার মতো
জ্বলজ্বল করছে আকাশের মা।
বাবা সরকারী ব্যাঙ্কের উচ্চপদস্থ অফিসার
মার সাথে বনিবনা ছিলো না, না থাকতেই পারে
রহস্যই রয়ে গেছে ওই অস্বাভাবিক মৃত্যু।

আকাশের ঘুম পায় না, ক্ষিদে পায় না আজকাল।
দুরন্ত আকাশ মনের ভেতর হাতড়ে বেড়ায়
মায়ের বড় লালটিপ পরা মুখ।
বাবার কাছে কিছুতেই যাবে না আকাশ।

দিদার বাড়ী, দিদার কোলে কুঁকড়ে থাকে ছেলেটা।
আকাশকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে শুক্লার জন্যে
আকাশের মধ্যেই অসুস্থ বৃদ্ধা, আকাশের দিদা
শুক্লাকে খুঁজতে থাকে দিনরাত।
আকাশকে আঁকড়ে, আকাশের জন্যে
দিদা সোজা হয়ে দাঁড়ায়। বয়স বাধা দেয়
প্রতিপদে প্রতিনিয়ত।

সাউথ পয়েন্ট স্কুলে পড়ে আকাশ।
দিদার হাত ধরে সকাল নটায় উল্টোডাঙ্গা থেকে
রোজ স্কুলের পথে আকাশ।
প্রথম প্রথম বাবা গাড়ী পাঠাতো
ছেলেকে ফেরত পাবার জন্যে কোর্টকাছারি করে
হেরে গেছে বাবা,
আকাশ দিদার কাছেই থাকবে, রায় দিয়েছে কোর্ট।
বাবা গাড়ী বন্ধ করে দিয়েছে, পয়সা পাঠায় না বাবা।
বিধবা বৃদ্ধার পেনশানের পয়সায়
আকাশ আর বৃদ্ধার সংসার।

সকাল নটায় খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে বৃদ্ধা এক হাতে
আকাশ, এক হাতে ব্যাগ-জলের বোতল।
স্কুলে পৌঁছে দিয়ে দিশেহারা বৃদ্ধা
রোদে জলে সর্দিতে রাস্তার ধারে, গাছের গোড়ায়,
পার্কের বেঞ্চে, একডালিয়া এভারগ্রীন ক্লাবের বেঞ্চে কাটায়
সোম-বুধ-শুক্র বিকেল পাঁচটায় ছুটি,
মঙ্গল-বৃহস্পতি স্পেশাল ক্লাস সন্ধ্যে সাতটা পর্যন্ত।
বৃদ্ধা দিদা রোজ ঠায় বসে থাকে কোলকাতার রাস্তায়।
ষাট-পয়সট্টির আকাশের দিদা।
একদিন জিজ্ঞেস করেছিলাম—
"মাসিমা এত কষ্ট করে সারাটা দিন
স্কুলের সামনে এভাবে বসে থাকেন?"

—"কি করব বাবা, ভয় হয় আকাশের
বাবা স্কুলে এসে যদি নিয়ে যায় আকাশকে?
ফোনে হুমকি দেয়, শাসায় ওর বাবা।"

রাতে ক্লান্ত অবসন্ন আট বছরের আকাশ
তার থেকেও অবসন্ন বিপন্ন দিদার হাত ধরে
উল্টোডাঙার রাস্তা ধরে বাইপাসের পথে।
বাড়ীতে ফিরে আকাশের জন্যে রান্না করে দিদা,
ভাত মেখে দেয়, গোল্লা গোল্লা করে মুখে পুরে দেয়
রাতে ভূতের গল্পো শোনায়, আকাশের জন্যে
সোয়েটার বোনে, ঘুমপাড়ানি গান শোনায় দিদা
রাত বাড়ে, রাত বাড়তে থাকে।

পূর্ণিমার চাঁদ সারাটা আকাশ রাঙিয়ে
আকাশের জানালা ছাপিয়ে আকাশের হাত,
আকাশের মুখ, আকাশের শরীর ছুঁয়ে যায়
তবু আকাশরা ভাবলেশহীন তাকিয়ে থাকে জানালার দিকে।
রাতের পর রাত
দিনের পর দিন
আশৈশব
আকাশরা ঘরে ঘরে নিদ্রাহীন কাটায় এভাবেই।

চলে যাবি?

চলে যাবি তুই?
বিপন্ন অসহায় বাপকে ফেলে
কোথায় যাবি মা?
আমি তোকে মেয়ের মতোন করে মানুষ করতে চাইনি।
জানি এ পৃথিবী
এ পৃথিবীর সমস্ত শিক্ষিত মানুষ, অশিক্ষিত মানুষ,
আমাকে মূর্খ বলবে, স্বার্থপর বলবে।
কিন্তু কেবলই আমার বেলায়
একটু ব্যতিক্রম হয় না?
অথবা আজ থেকে নিয়মগুলো বদলে যেতে পারে না?

জানিস মা আমার সারারাত ঘুম আসে না,
রোজ রাত সাড়ে নটা বাজলেই
"পাপ্পা ডু ইউ ওয়ান্ট টু স্টাডি?"
রোজ আমি "না" বলি আর তুই রেগে যাস
যতক্ষণ পড়তে না বসি তোর রাগ কমে না
মাথায় ওড়না দিয়ে ফলস্ চুল বানিয়ে
তুই আন্টি সাজিস,
কেমন খসখস করে চক ডাস্টার দিয়ে বোর্ডে লিখিস,
আমি তো রোজ ইংলিশ বানান ভুল লিখি
প্রিপোজিশান ভুল করি।
পড়া করিয়ে আমাকে ডায়েরী লেখাস—
হোমওয়ার্কের জন্যে।

চলে যাবি তুই?
সন্ধ্যে হলেই কে আমায় ফোন করে বলবে

"পাপ্পা তোমার বাড়ি আসার সময় হয়নি?
আর আসার কি দরকার?"
কার সাথে টিচার টিচার খেলব আমি, বল মা?
ওষুধ ভুলে গেলে কে আমায় জল এগিয়ে দেবে?
একলা থাকতে আমি ভয় পাই মা,
কোথায় যাবি তুই আমায় ফেলে?
কোথায় যাবি তুই?

আমার বোনটা

দশ বছরের ওপর হয়েছে
বোনের বিয়ে হয়েছে,
যেন কত দূর চলে গেছে বোনটা।
এভাবে তো কখনো ভাবিনি
ভাবার ফুরসত মেলেনি গত দশ বছরে।
এতো ব্যস্ত ছিলাম!

এখনও পর্যন্ত মা বাবার থেকে দূরে থাকা—
আমার কল্পনার বাইরে,
অথচ আজ থেকে দশ বারো বছর আগেই
একটি পঁচিশ ছাব্বিশের মেয়ে তার
ভিটেমাটি থেকে বিদেয় হলো?
একটা অচেনা পরিবেশ অচেনা পরিবারকে
কেমন নিজের করে নিলো!
কখনো এভাবে তো ভাবিনি আগে।
এতো স্বার্থপর হয় ভাইয়েরা?
ফুরসত নেই ভাববার, বোনেদের মঙ্গল কামনার?

দশ বছরের ওপর হয়ে গেলো বোনটার দিকে
ভালো করে ফিরেও তাকাইনি,
ওর মুখটাও দেখিনি পর্যন্ত মন দিয়ে।
অথচ এই ছোট্ট বোনটা কি
রাখী পরাতে ভুলেছে কখনো?
প্রতি বছর উপোস করে থাকে
রাখী পরানোর দিনে,
উপোস করে থাকে ভাইফোঁটার দিনটায়।
বছর বছর উপোস থেকেছে, রান্না করেছে

ভাইকে ফোঁটা দিয়ে
ভাত-আলুভাজা-ডাল-আলুপটল-মাছ-পাঁঠার মাংস—
চাটনি-দই-মিষ্টি যত্ন করে খাওয়াবে বলে,
আর দাদার ফোঁটা নেবারই সময় নেই!
এবারেও তো বিকেল চারটেয়
বারুইপুর হয়ে এসেছি বোনের বাড়ি,
চারটে অবধি না খেয়ে বসেছিল বোনটা
আমার মঙ্গল কামনায়!

ভাইয়েরা কখনো উপোস থেকেছে বোনেদের মঙ্গল কামনায়?
কোনো নিয়ম কি তৈরী করা যেতো না বোনেদের জন্যে?
আমার মা-ও তো একদিন ভিটেমাটি ছেড়ে বেড়িয়ে এসেছে,
আমার স্ত্রীও তো একদিন......
যত বড় হচ্ছে মেয়েটা, আমার ছোট্ট মেয়েটা,
কোনো এক অজানা ভয়, আতঙ্ক, দুঃখ
আমায় ঘিরে ধরে—
আমায় ঘিরে থাকে সারাক্ষণ।

শায়ন-সুদেষ্ণা

একটি মেয়ে বাড়ির পাশ দিয়ে রোজ যেতো।
সকাল সকাল ঘুম ভাঙলেই ব্রাশ করতে করতে
বেরিয়ে পরা শুধু তাকেই দেখবার জন্যে,
মেয়েদের কলেজের পাশে শায়ন ঘুরঘুর করে রোজ
সকাল সকাল।
একদিন মেয়েটা বাবার স্কুটার থেকেই পড়ে গেলো
রাস্তার টার্নিং-এ,
লজ্জায় লাল হয়ে আছে ফর্সা মেয়েটি
আর বুকফাটা আর্তনাদ শায়নের
গলার পাশে আটকে রইলো।
এটা কি প্রেম?
অপ্রাপ্ত বয়সের প্রেম?
হতে পারে। এত কিছু ভাববার অবকাশ কোথায়?

এভাবেই শুরু। এভাবেই প্রতিটি জীবনের শুরু।
আলাপ, পাশাপাশি পথ হাঁটা সুদেষ্ণার সাথে—
রোদে, জলে, বৃষ্টিতে
স্কুলফেরত, কলেজফেরত।
স্কুল বাঙ্ক, কলেজ বাঙ্ক,
মধুবন সিনেমা হলে হয়তো কোনো এক সন্ধ্যায়
প্রথম সিনেমা দেখা—"সাগর"।
হয়তো সেদিনই শায়ন সাইকেল কিনেছিলো বাবার পয়সায়,
সিনেমা শেষে পাশাপাশি রিক্‌শেতে বসে
অনেকটা পথ এগিয়ে দিয়ে
শিষ দিতে দিতে হেঁটে বাড়ি ফেরা।
ফেরার রিক্‌শে ভাড়া ছিলোনা শায়নের,
তবু গোটাটা রাস্তার মালিক যেন

সে নিজেই সেই উত্তেজক সন্ধ্যায়।
বহু পথ এভাবেই কেটে যায় শায়ন সুদেষ্ণার।
ঐ যে সেই সেদিন ভরা বর্ষায়
বৃষ্টিতে ভেসে গেছে গোটা কোলকাতা,
এক কোমর জল পেরিয়ে পেরিয়ে
ভেসে গেছে শায়ন সুদেষ্ণাও,
তবু প্রিয়া সিনেমায় পৌছোবেই বেলা একটায়।
রিক্‌শেতে চেপে কোমর জল পেরোতে পেরোতে
মুখ থুবড়ে পড়েছিলো গর্তে রিক্‌শেওয়ালা সমেত।
সিনেমা দেখা হয়নি ওদের
লেকের একপাশে কাকভেজা বৃষ্টিতে
ভিজে লেপটে ছিলো মুখোমুখি
শায়ন আর সুদেষ্ণা।

জীবনের চড়াই উতরাই ধরে পথ হাঁটা একসাথে
লড়াই ঝগড়া মনকষাকষি দাম্পত্যকলহ
সব আছে, সব কিছু আছে জীবনের গল্পেতে।
শায়ন সুদেষ্ণার দাম্পত্যের মধ্যগগনে
ফুটফুটে বর্ষা আছে সেই বৃষ্টির দিনগুলোর মতোন,
শায়ন-বর্ষা-সুদেষ্ণা তাই হাত ধরাধরি করে
রিক্‌শে চাপে। বৃষ্টি নামে, সিঁদুরে মেঘেও
ভয় নেই আর, জীবনের খানাখন্দেও
মুখ থুবড়ে পড়লে বৃষ্টিকে বুকে চেপে
বর্ষা এসে ছাতা হয়ে দাঁড়ায়
শায়ন আর সুদেষ্ণার সংসারে।

জীবন গল্পের গতিতে এগোয়,
অসমাপ্ত গল্পের আপন গতিতে
জীবন এগিয়ে চলে শায়ন-বর্ষা-সুদেষ্ণার হাত ধরে।

ছেলেটা

ভিড়ে ঠাসা ভাগিরথী এক্সপ্রেসে
একটি জায়গা পেয়েছি বসবার জন্যে,
গল্পগুজবে আধঘণ্টা কেটে গেছে,
বাদামভাজা ঝালমুড়ি কিনবো কিনা ভাবছি
ঠিক তখনই—
ছেলেটা পায়ের পাশ ঘেঁষে
এগিয়ে আসছে নিঃশব্দে।

শতছিদ্র তালি দেওয়া প্যান্ট
লজ্জা ঢাকতেও পারেনি ঠিক করে,
ততোধিক ময়লা গেঞ্জি পরা ছেলেটা—
ময়লা ঝাঁটা হাতে, পায়ের সামনে পড়ে থাকা
চায়ের গ্লাস, বাদামখোসা, শালপাতা ঝাঁট দিয়ে
পরিস্কার করতে করতে এগিয়ে আসছে।
বছর আটেকের ছেলেটা।

কেউ কেউ পা দিয়ে সরিয়ে দিচ্ছে ছেলেটাকে
আমার মতো সকলে নাকে রুমাল চাপা দিয়ে রেখেছে,
অনেকে গালাগাল দিচ্ছে ছেলেটাকে, তবুও
কম্পার্টমেন্টের এমাথা থেকে ওমাথা নীরবে
ঝাঁট দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে ছেলেটা।
চান না করে করে চুলে জট ধরে গেছে
ময়লা দুর্গন্ধে নাকে রুমাল দেওয়া ছাড়া গতি নেই ঠিকই
তবু জীবন কি দিলো আট বছরের ছেলেটাকে?
ঐ তো সবার কাছে হাত পাতছে কটা পয়সার জন্যে।
সবাইতো প্রায় ওর দিকে না তাকিয়ে একবার নমস্কার ঠুকছে
মানে—“মাপ করবি আমায়, তোর জন্যে

পঞ্চাশ পয়সাও নেই আমাদের পকেটে”,
কেউ কেউ একটাকা, পঞ্চাশ পয়সা দিয়েছে,
জীবন দিয়েছে শুধু যন্ত্রণা।

রাস্তায় ফেলে পালিয়ে গেছিলো মা-বাবা জন্মের পরেই।
রাস্তায় রাস্তায় বেড়ে ওঠা ছেলেটা
ভাগ্যিস উপলব্ধি করেনি এখনো
জীবনের কি নির্মম পরিহাস।
তাই রোজের গালি শুনে, বুটের লাথি খেয়েও
একটাকা, পঞ্চাশ পয়সার যুদ্ধ করে যায় ছেলেটা
ট্রেনের কামরায় কামরায়।
একটাকা, পঞ্চাশ পয়সার যুদ্ধ
রোদ জল বৃষ্টিতে
একটাকা পঞ্চাশ পয়সার যুদ্ধ
শিয়ালদহ থেকে রানাঘাট রোজ রোজ
দুবেলা রোজ রোজ।

জীবন সংগ্রাম

বিকেলে বহরমপুর থেকে কোনো
এক্সপ্রেস ট্রেন নেই কোলকাতা যাবার,
বহরমপুর স্টেশন থেকে বিকেল তিনটেতে
লালগোলা প্যাসেঞ্জার ট্রেনে চেপে বসলাম।
স্যাতস্যাতে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ পুরো ট্রেনে,
টয়লেটের দরজা ব্লক করে
হকারদের চা বানানো চলেছে পুরোদমে,
গেটের পাশে চিড়েচ্যাপ্টা অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছি—
অদৃষ্টের ওপর দোষারোপ করছিলাম মুহুর্মুহু।
একপায়ে দাঁড়িয়ে আছি দীর্ঘক্ষণ
দ্বিতীয় পা মাটিতে ফেলতে গেলে
অন্যের পায়ের ওপর পড়বে।

একটা ময়লা চাদড় মুড়ি দিয়ে
বছর ষাটের এক বৃদ্ধা
বসে আছে জানালার ধারের সিটে।
আমার কষ্ট দেখে বলে উঠলো
"বাবা তুমি বোসো আমি একটু দাঁড়াই।"
লজ্জায় বললাম—
"মাসি তুমি বুড়ো মানুষ পারবে না, বোসো।"
"বাবা আমি রোজ এই ট্রেনে আসি"।
আতকে উঠলাম, রোজ মানে?
"বাবা আমি টু ডাউন লালগোলায়
রোজ আসি এভাবেই। শিয়ালদা যাবো,
আমার দিনের মধ্যে কুড়ি ঘণ্টা ট্রেনেই কাটে
প্রতিদিন, প্রতিরাতে।"

দুপুর একটায় লালগোলা প্যাসেঞ্জারে
ভগবানগোলা থেকে মাসি ওঠে
ট্রেনটা আবার শিয়ালদহ যায় না, চিৎপুর যায়।
তাই সন্ধ্যে সাতটা নাগাদ মাথায় বেগুনের ঝাঁকা নিয়ে
নৈহাটী নেমে পড়ে, ট্রেন পালটে
রাত নটা-সাড়ে নটা নাগাদ শিয়ালদহ।
দুঘণ্টার মধ্যে স্টেশনের ধারে বসে
সব বেগুন বিক্রি করে—
রাত সাড়ে এগারোটায় সেভেন আপ
লালগোলা ফাস্ট প্যাসেঞ্জারে ফেরা।

রাত দেড়টা নাগাদ গুড়ের বস্তাওয়ালারা
নেমে যায় বিনপুরে—
একটু ট্রেনটা ফাঁকা হয়,
বাঙ্কে উঠে শুয়ে পড়ে মাসি।
সাড়ে তিনটেতে ঘুম থেকে উঠে পড়ে
বহরমপুর স্টেশন এলে,
নয়ত যদি জঙ্গীপুর পেরিয়ে যায় ঘুমের ঘোরে!
আতঙ্কে জিজ্ঞেস করলাম—এরকম হয়েছে কখনো?
"হ্যাঁগো বাবা, মাঝে মাঝেই তো ঘুম না ভাঙলে
সোজা লালগোলা এসে যায়,
আবার পরের ট্রেনে একঘণ্টা ফেরত আসি।"
নয়তো ভোর সাড়ে চারটেতে জঙ্গীপুর নামে মাসি।
বাড়ী পৌছোতে পৌছোতে ভোর পাঁচটা।

"তালা খুলে ঘর-দোর ঝাঁট দিয়ে
উনুনে আঁচ দিয়ে স্নান করতে যাই,
খাবার বানাই ভাত-ডাল-তরকারি,
ভাত খাই আর টিফিনকারিতে ভরে নিই।
এরপর ট্রেন ধরি ভগবানগোলা যাবার,
সকাল এগারোটায় ভগবানগোলা পৌছে
একটার মধ্যে হাট থেকে বেগুন কিনি, ঝাঁকা বাধি,
তারপর চেপে বসি এই টু ডাউন লালগোলায়।"

আমি অবাক চোখে তাকিয়ে
এই ষাটোর্ধ বৃদ্ধার দিকে,
জীবন সংগ্রামের বিবরণ কাগজে কলমে লেখা যায়?
জানালার দিকে ঘুরে বসে মাসী
প্লাস্টিক থেকে টিফিনকারি বের করে।
আমি উঁকি মেরে দেখতে থাকি,
মনের সুখে মাসী খেতে থাকে
জল কেটে যাওয়া ভাত-ডাল-তরকারি,
পৃথিবীর প্রতি কোনো অভিযোগ অনুযোগ নেই
ভাত শেষ হলে এক ক্যান জল ঢেলে
ধুয়ে কাঁচিয়ে চুমুক দিয়ে খেয়ে ফেলে এক নিঃশ্বাসে।
"মেয়ের বিয়ে দিয়ে দিয়েছি,
ছেলে বিয়ে করে আলাদা হয়ে গেছে,
স্বামী মারা গেছে সেই কবেই।"
একলা মহিলার ভাত ডালের এই অস্বাভাবিক জীবনসংগ্রাম
চোখ চেয়ে দেখতে থাকি।

ট্রেন এগিয়ে চলে কৃষ্ণনগর—তাহেপুর—
বিনপুর—রানাঘাট—চাকদহ,
অসহ্য গরমে আর চিড়েচ্যাপ্টা আমি
মাথায় ঘুরপাক খায় শুধু একলা মহিলার জীবন সংগ্রাম
ট্রেন এগিয়ে চলে নিজের তালে
বেসামাল বেতাল একলা আমি
একরাশ প্রশ্নের ঝাঁক মাথায় নিসপিস করতে থাকে
অনবরত।
ট্রেন এগিয়ে চলে নিজের মতো।

রুটি দাও

লোকটাকে দেখেছিলাম পড়ন্ত বিকেলের আলোয়
হাতুড়ি পিটিয়ে যাচ্ছে শাল-বল্লির গায়ে,
এক ঘা-দুই ঘা-ঘায়ের পর ঘায়ে
উন্মাদ মাঝবয়সের মানুষটি ফিরে ফিরে
পশ্চিমপারে লাল-হলুদ সূর্যের দিকে ফিরে দেখছিলো।
সন্ধ্যে নেমে আসছিলো ঝড়ের গতিতে বাইপাসের ধারে,
ঘন অন্ধকার অরো গাড়ো ওর মনের গভীরে।
আজও সব কাজ শেষ হবে না ওর,
কন্ট্রাক্টারের গাড়ীর শব্দে বুকের কান্না যেন
কণ্ঠনালীর ধার ঘেঁষে পথ হারায়।

"বাবু কাজ শেষ হয়নি আমার, একশো টাকা দাও
আটা কিনবো, সবজি কিনবো বাবু,
আটটা পেট বাড়ীতে,
বাবু একশোটা টাকা দাও আজ।"
পড়ন্ত বিকেল আর নেই এখন, ঘন অমাবস্যার
কালো মেঘে ঢেকে আছে বাইপাসের আকাশ,
বাড়ীর পথে ক্লান্ত শরীরটাকে বয়ে বেড়ানো,
যেন রোজকার একটাই চেনা শব দুয়ারে দাঁড়িয়ে।
"ছেলেমেয়েদের জন্মানোই পাপ হয়েছে আমার ভিটেতে"
অস্ফুট কণ্ঠস্বরে লজ্জা, ঘেন্না, ভয়।
"একটি রুটিও কি নসিবে নেই?"
সূর্যের আগে ঘুম থেকে উঠে পড়ে মানুষটা
দৌড়ে বেরিয়ে যায় ঘর ছেড়ে,
দৌড়ে দৌড়ে পেরিয়ে যায় চেনা পথ ঘাট এগোগলি
দূরে দূরে আরো দূরে যেতে চায় শরীর মন

যেখানে ছেলেটায় মেয়েটার কণ্ঠস্বর
নিশ্চিত পৌঁছোবে না।

ঘুম থেকে উঠেই তো ওরা চেঁচাবে
আব্বাজান, এই আব্বাজান
একটা রুটি দাও আব্বাজান।

কাঁটাতার

এপারে ভারী বুটের মার্চপাস্ট অনবরত রাতদিন
ওপারে মেসিনগানের গর্জন ভেসে আসে থেকে থেকে,
বি.ডি.আর জওয়ান আর সেনাপ্রধানরা জানি
একই পয়সার দুটো পিঠ।
পিলখানা ব্যারাকে আগের দিনেও
কর্নেলের ছেলেমেয়ে পার্কে দৌড়ে বেড়িয়েছে
কোনো এক বি.ডি.আর জওয়ানের পিঠে চেপে,
আজ বুড়ি গঙ্গায় ফুলে উঠেছে কারো স্ত্রী,
কারো পুত্র, কন্যা, জওয়ান, কর্নেলের
ফৌজি উর্দি পরা লাস,
গনকবর খুঁড়লে নিশ্চিত পাওয়া যাবে
আমার ভাইয়ের বোনের হাড়গোড়।
রক্তের হোলিতে মেতেছে বাংলাদেশ ওপারে
এপারে ভারী বুটের দীর্ঘশ্বাস হাহাকার।

তবু একদিন ধুয়ে মুছে যাবে এ কলঙ্কের দিন—
পেট্রোপোল সীমান্তের কাঁটাতার ধরে
জড়িয়ে জড়িয়ে বড় হচ্ছে অপরাজিতা ফুলের সার,
একদিন কাঁটাতারগুলি সব ভরে যাবে
নীল নীল তারার মতো ফুলে,
ওপারে মাইলের পর মাইল লাল গোলাপ আর
পদ্মের ঝাড়ে দিনে রাতে জল দেবে
আজকের কোনো জওয়ানের স্ত্রী,
এপারে দিগন্ত বিস্তৃত সাদা জবা, চন্দ্রমল্লিকার

সস্নেহ আলীঙ্গনে চটি পায়ে
আজকের ভারী বুট পরা ভারতের সীমান্ত রক্ষীরা
মহা আনন্দে দেশোয়ালী গান ধরেছে বেতাল সুরে।

কাঁটাতার বেয়ে বেড়ে ওঠা
অপরাজিতা, আকন্দ, বুনো গুল্মের
কোনো দেশ নেই জাতি নেই
তার গায়ে জল পড়ে, পানীও পড়ে
প্রতিদিন প্রতিরোজ।

চাঁদ

সকাল হবার আগেই—
ছাদের তুলসিতলায় রাখা আঁকশি দিয়ে
ঐ চাঁদটাকে পেড়ে এনে
আমার দুধসাদা ফুলশার্টের বুকপকেটে
লুকিয়ে রাখবো,
সারাটা সকাল ধরে সূর্যের তেজ বাড়ে—
আমি কিছুতেই রোজ রোজ
চাঁদটাকে খুঁজে পাই না
নীল আকাশের পাহাড় চূড়ায়,
সূর্যকে বড় উন্মাদ মনে হয় দিনভর।
সারাটা আকাশ জুড়ে আলোর ছড়াছাড়ি
সেই সকাল থেকে অথচ
অপূর্ব স্নিগ্ধতা শুধু আমার বুকপকেটে বন্দী।

পড়ার ঘরের মেঝেতে নয়তো
মায়ের খাটে গড়াগড়ি খাবো
দুপুর দুপুর চাঁদের সাথে,
বিকেল বেলায় ভাতঘুম সেরে
হাতমুখ ধুইয়ে চাঁদকে উড়িয়ে দেবো
আবছা আকাশের নীলে।
সন্ধ্যে গড়িয়ে গেলে চাঁদকে
আমার বুকপকেটে একদম মানায় না,
মাথার ওপর তখন শুধুই চাঁদ
ছুট্টে বেড়ায় সারারাত আমার সাথে
ছুট্টে বেড়ায় সারারাত আমার মাঝে।

চাঁদের পরী

চাঁদের দেশ থেকে একটি পরী এসে খবর দিলো
তুমি ভালো নেই,
লজ্জা শরমের পর্দা মুহূর্তে কর্পূরের মতো উবে গেলো।
পরীর হাত দিয়ে একটি মস্ত চিঠি পাঠালাম তোমার জন্যে—
দীর্ঘপথে পরী চিঠিটি পড়ে ফেললে জানিনা কি হবে।
চাঁদের রাজার কাছে ছুটি চেয়ে
চলে এসো না হয় পরীর সাথে,
রাগে দুঃখে মরে যেতে ইচ্ছে করছে—
মরে গিয়েও চাঁদের মেয়ের কাছে যাওয়া যায় শুনেছি।
মাথায় যা যা দুষ্টুবুদ্ধি আসছে
তুমি শুনলে লজ্জায় লাল হয়ে যেতে,
হৃৎপিণ্ডের ধড়ফড়ানি কয়েকশো গুন
বেড়ে গেছে মনে হয়,
কি করব? আমি চেপে থাকতে পারি না বলে
সব লিখে ফেললাম।

প্রতিটি পূর্ণিমা রাতে
আমার কুঁড়ে ঘরের দাওয়ায়
জলভরা কাঁসার থালা সাজিয়ে বসে থাকি,
তোমার চাঁদমুখ ধরা থাকে জলের ভিতর,
চাঁদের রাজা খুব রাগী জানি—
আমি তোমায় চাঁদের দেশ থেকে চুরি করে
আমার কুঁড়েঘরের মাটির ওপর
নিয়ে আসব—আমি নিশ্চিত।

মাটির ঘরে, চিলেকোঠার ফাঁকে,
বারান্দার ফুলের টবের পাশে,

হোগলার চালে লতানো লাউডগার ফাঁকে ফাঁকে,
শোবার ঘরে কাথা কম্বল চাপা দিয়ে,
মায়ের ঠাকুর ঘরে ফুলের সাঝির ওপর,
কোথায় কোথায় যে তোমায় লুকিয়ে রাখবো
সেই ভাবনায় কাটছে সারাবেলা।

শুনছো

শুনছো?
এত মানুষ রোজ অবাক চোখে তাকিয়ে থাকে
একমনে চাঁদের দিকে সারারাত
আমার খুব চিন্তা হয়।
ঐ সুতোটা ছিঁড়ে নামিয়ে নাও তো চাঁদটাকে—
একটা কাজলের টিপ পরিয়ে দিই কপালের ডানপারে।
চাঁদের আলো দিয়ে ঘোমটা বানিয়ে
তোমাকে পরিয়ে দেবো ভাবছি,
এরপর তুমি আকাশের তারাগুলোকে
একটা একটা করে পেড়ে এনে আমাদের
বেডরুমের সিলিং-এ
ইলেকট্রিশিয়ান ডেকে বসিয়ে দাও তো।
আকাশের একটু বিশ্রাম দরকার।
সারাটা সকাল ধরে রোদে পুড়ে ঝলসে আছে
আকাশটা এই মাঝরাতেও, কিন্তু
এই মাঝরাতে ইলেকট্রিশিয়ান তো পাবে না,
আবার কাল ভোর হলে তারাগুলো হারিয়ে যাবে।

শুনছো?
তারাগুলোকে তুমি জুয়েলারী বক্সে গুনে গুনে
রেখে দাও তাহলে আজকের রাতটা, আর
কাল সকালে আমাদের বেডরুমে যেন
সূর্যের আলো না ঢোকে,
নয়তো ইলেকট্রিশিয়ান ডেকে আনবার আগেই
তারাগুলো ডানামেলে পালাবে
ঐ আকাশের নীচে।

শুনছো?
তুমি কি শুনতে পাচ্ছো?

প্রথমার সাহিত্য

যাদবপুর স্টেশনে সন্ধ্যে সাতটায়
প্ল্যাটফর্ম পরিস্কার দেখা যায় না,
সোনারপুর লোকাল ঠিক তখনই ঢুকেছে দু'নম্বর প্ল্যাটফর্মে,
এক কোণায় আদা-রসুন-পেঁয়াজ বিক্রি হচ্ছে পাইকারি দরে,
এসব রোজকার এক ছবি সাহিত্যের চোখে পড়ছে না আজ।

প্ল্যাটফর্মের এমাথা ওমাথায় অস্থির পায়চারী করছে
সাহিত্য সেই তখন থেকে,
প্রথমা আজ কথা দিয়েছে আসবে—
প্রথমার সাথে প্রথম প্রেমের উত্তেজনায়
সাহিত্যের এরকম অস্থির পায়চারী,
থেকে থেকে ঘড়ি দেখে চলেছে আর
মোবাইলে মিসড্‌কল।
—"এক্ষুনি আসছি সাহিত্য, রিক্‌শেটা ভীষণ জ্যামে পড়েছে"
—"ঠিক আছে, তুমি স্টেশনের ফুটব্রীজ পেরিয়ে দু'নম্বরে এসো কিন্তু"
সাহিত্যের আর তর সইছে না, মুহূর্তগুলো সব বিষময় লাগে।

সন্ধ্যে সাতটা হবে তখন—
ফুটব্রীজের আঁধার থেকে
জিন্সটপ পরা ফুটফুটে প্রথমা
সাহিত্যের আকাশে কবিতার মতো লাফিয়ে পড়লো,
এক লাফে ভরা প্ল্যাটফর্মে সাহিত্যের কোলে চেপে বসল,
সাহিত্যের ছটফটানি কয়েক মুহূর্তের জন্যে স্তব্ধ হয়ে রইল।
জনাকীর্ণ স্টেশনের প্রেক্ষাপটে
নিজেকে চিমটি কেটে যেন সম্বিত ফিরে পেল সাহিত্য।

কিন্তু তখনও থমকে ছিলো
রেললাইন, ছায়াছায়া লোকালয় পথঘাট,

প্ল্যাটফর্মের গা ঘেসে বেড়ে ওঠা
সবজিবাজার মাছবাজারের জনকোলাহল হাঁকাহাঁকিও
থমকে ছিলো আরও অনেকক্ষণ
সাহিত্য-প্রথমার প্রেমকাহিনীতে বুঁদ হয়ে।

এরপর ষ্টেশনের গা ঘেসে মাটির রাস্তা ধরে
নেমে গেলো
সাহিত্য-প্রথমা হাত ধরাধরি করে,
পালবাজার—গরফা মেইন রোড—আনোয়ার শাহ বাইপাস কানেকটার—
রুবি জেনারেল—সায়েন্সসিটি—নিক্কোপার্ক
গোটা কোলকাতা দাপিয়ে বেড়ালো সাহিত্য
প্রথমার প্রেমে হাবুডুবু খেতে খেতে।

তুমি না থাকলে

তুমি বাড়ী থাকলে—
হয়তো ফিরেও তাকাই না ঘণ্টার পর ঘণ্টা,
নিজের মনে দরকারী কাজ সারি,
কবিতার খাতায় আঁকিবুকি কাটি সময় সময়,
মেয়ের সাথে কাটাকুটি খেলি,
রং তুলি দিয়ে নীল আকাশ, পাহাড়ের চূড়া
পাহাড়ের কোলে আমাদের বাড়ী, অশ্বত্থ গাছ
আঁকি বৃষ্টির ড্রইং খাতায়।

তুমি না থাকলে—
শূন্যতা ঘিরে থাকে ডায়েরীর পাতায়,
কবিতার খাতা তোলা থাকে তাকের শেষপ্রান্তে,
মেয়ের অস্থিরতা ছুঁয়ে ফেলে
আমার একলা নিঃসঙ্গতা,
নিস্তরঙ্গ একাকীত্ব তোমার উপস্থিতিতেই
সবুজ মনে হয়, যেন বরফের গায়ে হলুদ ফুল ফোঁটে
যেমনি নিশ্চিন্তে বসে তুমি সিরিয়ালে
"এখানে আকাশ নীল" দেখো
আর রং তুলি হাতে
আমি ছবি আঁকি কবিতার খাতায়।

পানসে প্রেম

ছিবড়ে হয়ে যাওয়া আখের মণ্ড
স্তুপীকৃত ডাস্টবিনের গায়ে,
একটা পেষাই মেসিন সারাদিন ধরে
চেপে ধরে নিংড়ে নিয়েছে জ্যান্ত আখের থেকে
সবটুকু রস, সবটুকু মিষ্টি এক চুমুকে
খেয়ে ফেলেছে অনেকে, রোজ রোজ।
যা পড়ে আছে ডাস্টবিনের ধারে
তাকে ছিবড়ে বলে।
ছিবড়ের সাথে কারো কোনো প্রেম নেই।
কিন্তু ছিবড়ে হয়ে যাওয়া শরীরটাতো আছে—
দেহটাকেও নিস্তার দেয় না ওরা
জ্বালিয়ে পুড়িয়ে উপভোগ করে।
চিয়ার্স।

তুমি চাইলে

তুমি চাইলে তোমার বাগানে ঝাঁপ দিয়ে
জল ফড়িং আর প্রজাপতি ধরে আনতে পারি
তোমার গায়ের পাশে উড়ে বেড়াবার জন্যে
দেখে নিও।

তুমি চাইলে তোমার দুচারটে
পছন্দের প্রেমিককে বেঁধে রেখে আসতে পারি
তোমার মনের পাশে ঘুরে বেড়াবার জন্যে
দেখে নিও।

তুমি চাইলে—
ঘুম পাড়ানি গান গাইতে পারি মিষ্টি সুরে
অথবা হার্ড রক দুরন্ত উন্মাদনায়
তোমায় একটু তোয়াজ করবার জন্যে
দেখে নিও।

তুমি চাইলে—
দিন আর রাতকে কাথাকম্বল চাপা দিয়ে
উষ্ণতা খানিকটা কমিয়ে নিয়ে আসতে পারি
তোমার যাকে পছন্দ বেছে নিও।

তুমি চাইলে—
ঐ তারাগুলোকে মাটিতে পেড়ে
তোমার শাড়ীর ভাঁজে ভাঁজে লুকিয়ে ফেলতে পারি
তুমি দেখে নিও।

তুমি চাইলে—
আমার মতো দেখতে একটি আস্ত পাগলকে
তোমার শোবার ঘরের খাটের সাথে
বেঁধে রাখতে পারি চব্বিশ ঘণ্টা
তুমি দেখে নিও।

তোমাকে নয়

তোমাকে দেখেছি আমি লোকাল ট্রেনের কামরায়
ঠায় দাঁড়িয়ে কাটিয়েছো পাঁচ সাত ঘণ্টা একভাবে,
তোমাকে দেখেছি আমি একঘেয়ে জলসায়
নির্বিকার বসে থেকেছো কি দারুণ আগ্রহে,
তোমাকে দেখেছি আমি "অন্তহীন" সিনেমার সেটে
পপকর্ন খেতে খেতে অপলক চোখে চেয়ে থাকা।

নর্দমার কাঁদা আজ দুধসাদা ব্লিচিং-এ মোড়া,
মশার লার্ভাগুলো ভেসে যায় দুরন্ত স্রোতে,
ম্যালেরিয়া মরেছে বুঝি নর্দমার আঁস্তাকুড়ে,
পচা শামুকে তবু কেটে গেছে দাঁত নখ।

তোমাকে দেখেছি আমি আউট্রাম ঘাটে
আধবোজা চোখে তুমি সূর্যাস্তের খোঁজে
পিছমোড়া করে বেঁধে রেখেছি
তোমাকে নয়—
সূর্যোদয়ের আলো,
তোমার সম্মুখে তখন আউট্রাম ঘাট আর
সূর্য নেবার কালো।

নীল নির্জনে

নীল নির্জন সমুদ্রতটে
লক্ষ লক্ষ লাল কাঁকড়ার সাথে
লুকোচুরি খেলছিলো আমার শৈশব,
আর যৌবন আকাশের নীলে গড়াগড়ি খাচ্ছিলো
পরম আনন্দে মাইলখানেক দূরের
চিকচিকে সাদা বালুকাবেলায়,
যেথায় স্বল্পবসনা একলা তরুণী
দিশেহারা খুঁজে ফেরে প্রেমিকের
পাগলকরা আবরণহীন বুক।

শৈশব তখনও ছুটছে ফিরছে
কাঁকড়ার বাসায় বাসায়
নিঃশব্দ সমুদ্রতটে,
আর যৌবন—
জামা খুলে জামা উড়িয়ে
ছুটে যায় উন্মত্ত পদক্ষেপে,
নিরুদ্দেশ যাত্রা বুঝি
মরিচীকার পিছে পিছে।

মায়েরা

তিনজন মা স্কুলফেরত গড়িয়াহাট ওভারব্রীজের
নীচে গল্পে মশগুল, তাদের
বাচ্চারা দৌড়ে বেড়াচ্ছে, ছোঁয়াছুঁয়ি খেলছে।

এক মায়ের চিৎকার—
ববি ডোন্ট সাউট, ডোন্ট রান টু মাচ'।
তবুও তিনটে বাচ্চা মায়েদের চারিপাশে
গোল গোল দৌড়ে বেড়াচ্ছে ছুটির আনন্দে।

আরও দুটি বাচ্চা—
তাদের মায়ের চোখরাঙানি নেই
মা তখন একহাত দূরেই
ভাতের হাঁড়ি চাপিয়েছে কুড়িয়ে আনা
কাঠ, পচা বাঁশ, নারকোল পাতার উনুনে।
বাচ্চা দুটি ফুটপাতে গড়াগড়ি খেতে খেতে
লালিপপ খায়, ডিগবাজি খায় মনের সুখে।

ফুটপাতের মা ভাতে সেদ্ধ ভাত রাঁধে—
পাকা বাড়ীর মা, ফ্ল্যাটের মা,
ফুটপাতে সব মায়েরা গল্পো গুজবের মাঝখানে
ছেলেমেয়েদের নিয়েই মেতে থাকে গোটাদিন।

দাদু ঠাকুমা

ঠাকুরদাকে দাদু ডাকতাম আমি—
দাদু ঠাকুমার কোলে পিঠে আদরে আহ্লাদে
বেড়ে উঠেছি, বড় হয়েছি আমরা
কত সুখস্মৃতি জড়িয়ে আছে দাদু ঠাকুমার সাথে।
রোজ আমাকে আর বোনুকে
মিষ্টির দোকানে নিয়ে যেতো দাদু,
দাদুর হাত ধরেই তো সেই ছোটোবেলা থেকে
রোজ বাজারে যেতাম, মাছ সবজি চিনতে শিখেছি।

একটু বড় হয়ে—
দাদুর জামার পকেট থেকে রোজ পয়সা চুরি করতাম—
দাদুর বিড়ি কেনবার পয়সা,
"ভাই নিস না, আমার বিড়ি নাই আজ"।
ঠাকুমা ঘরে ট্রাঙ্কের ভিতর ছোট্ট বাক্সের মধ্যে
রুমালে গিট দিয়ে পয়সা রাখতো
আমি তাও নিয়ে যেতাম।
ঐ পয়সায় স্কুলের গেটের সামনে আচার খেতাম
আলু কাবলি ঝাল বেশী দিয়ে খেতাম।
দাদু ঠাকুমার হাত ধরে অনেক দূরে দূরে
হেঁটে হেঁটে দূর্গাঠাকুর দেখতাম,
ভারতমাতা, বিজয়গড়, নেতাজীনগর
ঠাকুরবাড়ী খিচুড়ি খেতে যেতাম।

পায়ে পায়ে স্কুল ফেলে কলেজে পা রাখলাম
ব্যস্ততা পড়াশুনো নিয়ে, ব্যস্ততা নিজেকে নিয়ে,
তার মধ্যেও রাতে একসাথে তাস খেলতাম

টুয়েন্টি নাইন খেলতাম
মা-বাবা-আমি আর দাদু।
দাদু গোটা দিনটা তাকিয়ে থাকতো
কখন আমি বাড়ী ফিরবো
একটু তাস খেলবে দাদু।

একদিন চলে গেলো দুজনেই।
দিন চলে যায়, হারিয়ে যায়,
কুড়িটা বছর ফেলে এসেছি,
এত কর্মব্যস্ত জীবন যে গত কুড়ি বছরে
কুড়িবারও বোধহয় মনে পড়েনি দাদু ঠাকুমাকে,
অথচ শেষের কদিন প্রায় অচৈতন্য অবস্থায়
কাউকে চিনতে পারতো না দাদু
শুধু হঠাৎ হঠাৎ আমার নামটা ডেকে উঠতো।

এই স্নেহ জড়িয়ে জড়িয়ে জীবনের বন্ধন হয়
জীবন এগোয় নিজের গতিতেই,
হঠাৎ করে আজ
স্নেহের স্মৃতিগুলো বেশী বেশী করে
হাতড়ে ফিরি আমি।

আমি নেই

তোমার মধ্যে এমন ভোরের অনুভূতি আছে যে
আমি জেগে উঠি সকাল হবার আগেই,
তোমার মুখে ভোরের ফুল ফোঁটে,
শিশির ভেজা দুর্বাঘাসের স্পর্শ
যেন আমার জানালাপাশে উঁকি মারে।
তোমার মধ্যে এমন নিরুত্তাপ আগুন আছে যে
আমি বসে থাকি শীতের দুপুরে
আবছা রোদের আকর্ষণে।
তোমার মধ্যে কুয়াশা মাখানো সাঁঝবেলা
ভর করে আবছা নিওনের আলোয়,
আমি অবাক চোখে চেয়ে থাকি—
কখনো কুয়াশা হারায় তীক্ষ্ণ নিওনের আভায়
কখনো নিওনের আলো ডুবে যায় গাড়ো কুয়াশার আবরণে।

তোমার মধ্যে সবকিছু আছে
শুধু আমি নেই—
তোমার মধ্যে শুধু আমি নেই।

তুমি এসো

যখন সন্ধ্যে নামে বকুলবনে
দীপ জ্বলে যায় ঘরে ঘরে
সাঁঝের প্রদীপ নিয়ে উঠোনপারে
তুলসিতলায় খালি পায়ে একলা তুমি এসো।
আমি চুপটি করে দাঁড়িয়ে রব
চালতাতলার আঁধার পারে,
চালতাতলার ডানপাশেতে
রাঙাকাকুর পুকুর পরে
শান বাঁধানো ঘাট আর
বাঁশবনের মাঝ দিয়ে
একচিলতে সরু রাস্তা ধরে
একটু হাঁটবো তোমার সাথে
একটু ছুঁয়ে দেখবো তোমায়
পা দুখানি ডুবিয়ে জলে
থাকবো বসে ঘণ্টাখানেক,
সন্ধ্যে তখন রাতের মাঝে
মিলিয়ে গেছে আপন মনে
বিদায়বেলার প্রতিশ্রুতি নিয়ে
ফিরবো কেবল আজকের মতোন।

এমনি করে
আরও একটি
সন্ধ্যে যদি
অন্য কোনো বকুলবনে
অন্য কোনো তুলসিতলায় নামে,
আমায় তুমি পাবে সেথায়
চালতাতলা যদি থাকে
উঠোনপারে তুলসিতলার পাশে।

একটি স্টেশন

একলা যখন ভাবতে বসি
সকাল বিকেল সন্ধ্যেবেলায়
একটি ষ্টেশন দাপিয়ে বেড়ায়
একটি প্ল্যাটফর্ম পিছলে পড়ে
শ্যাওলা সবুজ মনের ধারে
সুভাষগ্রাম সুভাষগ্রাম।

একটি ষ্টেশন স্বপ্নমাখা
একটি ষ্টেশন বিশ বছরে
একটি বারও দেয়নি দেখা
হয়নি হাঁটা ঘাসের পথে
ভীষণ চেনা বাঁশের সাকোয়
কচুরিপানা পানকৌড়ি
একটি ঘরের একলা বাড়ি
একলা তোমার গন্ধ মাখা
মনের পাশে ছবি আঁকা
শুধুই তোমার স্পর্শ রাখা
সুভাষগ্রাম সুভাষগ্রাম।

মাঝগগনে রৌদ্র তবু
সন্ধ্যে নামে জীবনপথে
একলা আমি ভাবতে বসি
শস্য শ্যামল রৌদ্রছায়ায়
একটি ষ্টেশন দাপিয়ে বেড়ায়
সামনে ফিরি পেছন ফিরি
দু'দিকেতেই একটি নাম
সুভাষগ্রাম সুভাষগ্রাম।

যদি ফিরে পেতাম

যদি ফিরে পেতাম আমার ছেলেবেলার দিনগুলো
স্কুলের মাঠে একটি নারকেলের খোলা দিয়ে ফুটবলের আনন্দে
হাফপ্যান্ট পড়া দশটি ছেলে এখনও দৌড়ে বেড়ায়
আমার ছেলেবেলায়।

যদি ফিরে পেতাম সেই বর্ষার দিনগুলো
দাদুর বানানো কাগজের হাতনৌকো
রাস্তার এক কোমড় জলে ভাসিয়ে দিয়ে
পরের নৌকোর জন্য দাদুকে তাড়া দিতাম,
কোনোটা ভেসে যেতো আপনমনে,
কোনোটা জলে ভিজে উল্টে যেতো,
বৃষ্টি মাথায় ছুটে গিয়ে
উল্টো নৌকো সোজা করার খেলায় মেতে থাকতাম।
বর্ষা তখন নৌকো ছেড়ে আছড়ে পড়েছে
আমার মাথায়, গায়ের পাশে,
বর্ষামুখর দিনগুলোতে।

যদি মায়ের হাত ধরে ব্যাগ কাঁধে
আবার যেতে পারতাম ফোর্টিওয়ান বাসস্টান্ডের লাইনে,
যদি ফিরে পেতাম সামার ভ্যাকেশানের আনন্দ
দাদু-ঠাম্মার হাত ধরে পিসি বাড়ি বেড়াতে যাওয়া,
জীবনের ঐসব দিনগুলো জানি ফিরে আসে না।
তবু ফিরে দেখা যায়
ছুঁতে চাওয়া যায়
হৃদয় গহ্বরে একটি ছোট্ট ডুব দিলেই পরিস্কার
আমার ছেলেবেলা—
আমার মতো বহু মানুষের ছেলেবেলা
যদি একবারও পেতাম ফিরে।

শীতের সকালে

শীতের কাঁথা কম্বল মুড়ি দিয়ে
চোখ খুলেছি আমি,
তখন সবে সকাল পাঁচটা বাজে।
ঘন কুয়াশার চাদড়ে মুড়ি দিয়ে
বসে আছে সকালের প্রকৃতি,
বড্ড দুর্বল লাগছে ঘুম থেকে উঠেই
দুর্বল লাগছে গত কয়েকদিন থেকেই।
চল্লিশ বছর বয়সটা বড্ড অ্যালার্মিং
প্রেসারের ওষুধ খেতে হয় দিনে দুটো করে
সুগারের ভয়ে কুঁকড়ে থাকি প্রতিদিন
খাবার বিধিনিষেধ ভূতের মতো
ঘাড়ে চেপে থাকে রাতদিন।
বড্ড দুর্বল লাগছে কাঁথা কম্বলের বাইরে আসতে
তবু বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লাম,
মিনিট কুড়ির মর্নিং ওয়াক আমাকে
মানসিক ভাবে সুস্থ রাখে
তাছাড়া প্রকৃতির সাথে হ্যান্ডশেক
করা যায় সকাল সকাল।
প্রকৃতির পাশে হাঁটাচলা করা
শিশিরের স্পর্শ পায়ের পাতা হয়ে
শিরা উপশিরা গড়িয়ে আমার শরীরের
প্রতিটি অংশে পূর্ণতা পায়।
আমি এগিয়ে চলি
কুয়াশা মাখানো পথে
শিশিরের পায়ে পায়ে
স্নিগ্ধ শীতল ভেজা ঘাসের স্পর্শে
মিনিট কুড়ির লক্ষ্যে
এগিয়ে চলি আমি।

শীত মানে কি?

শীত মানে?
সকালে ঘুম থেকে ওঠার অশান্তি
ঘাপটি মেরে পড়ে থাকি সারা গায়ে আলস্য জড়িয়ে
নটা অবধি রোজ।
অফিস কাছারি যেতে ভালো লাগে না
ঘণ্টার পর ঘণ্টা লেগে যায় স্নান করার ইচ্ছেতে,
কোনো রকমে স্নান সেরে একদৌড়ে ছাদে—
দাদুর সাথে মাদুর পেতে রোদ পোহানো রোজ।

শীত মানে?
দুপুর দুপুর
গরম গরম ভাত, আলু ফুলকপির তরকারি, মুগডাল—
এক ঘণ্টার শীতঘুম লেপ কাঁথা জড়িয়ে।
বিকেল পাঁচটা নাগাদ ঘুম ভেঙে গেলে
ঘণ্টাখানেক অলসভাবে বসে থাকা—
রেডিওতে রফির মনমাতানো রোমান্টিক গান
সাথে এক কাপ চা।
সন্ধ্যেটা কাটে পাড়ার মোড়ে চাদড় মুড়ি দিয়ে,
শুকনোপাতা জড়ো করে জ্বালিয়ে
আগুন পোহানো রাত আটটা অবধি।

শীত মানে?
রাত আটটা থেকে
স্ট্রীট লাইটের নীচে ঘণ্টাখানেক ব্যাডমিন্টন খেলে
হাঁপিয়ে ঘরে ফেরা—
হাত পা ধুয়ে ডাইনিং টেবিলে সোজা
ঝাল ঝাল দম আলু, ডিমের ঝোল ভাত,

এরপর
বিছানায় লেপের গভীরে
মুহূর্তে নাক ডাকা শুরু
সুন্দরী স্ত্রী তখনো গালি দিয়েই চলেছে—
হ্যাঁ হ্যাঁ আমি নিশ্চিত
স্ত্রী তখনো গালি দিয়েই চলেছে
রোজ রোজ বিছানায় গা এলিয়েই নাক ডাকার জন্যে।

শীত মানে স্বস্তি
শীত মানে কল্পনা
শীত মানে পিঠে পুলি
শীত মানে স্বপ্ন দেখা
শীত মানে বাস্তবে
বাঙালীর শীতে কেঁপে বেঁচে থাকা।

চলো

আমি থাকি বা না থাকি
বসন্ত ঋতু ফিরে আসবে

আমি থাকি বা না থাকি
গাছে গাছে সিল্কের মতো কচিপাতা ফুটবে

আমি থাকি বা না থাকি
সন্ধ্যের আঁচলে লুকিয়ে চুপিচুপি রাত আসবে
বসন্তের নিশুতি রাত।

কাল যদি আবার দেখা হয় খুশি হবো
আগত সকালগুলো জানে
কি কি নতুন রং আনবে তোমাদের জন্যে
চলো এতো ভাবার কি আছে?
এগিয়ে চলি হাত ধরাধরি করে
নিরুদ্দেশের দেশে।

আবির

সকাল থেকেই মনের কোণায় আবিরের ছড়াছড়ি
লাল, সবুজ, হলুদ, বেগুনী আরও কত
রঙে রাঙানো উৎসব মুখরিত প্রকৃতি।
কচিকাঁচাদের দল মনের আনন্দে
আবির ছড়াচ্ছে সমানে,
বয়সের ভেদাভেদ আজ শেষ—
ছয় থেকে ষাট আবিরে রঙীন,
রাস্তাঘাট ঘরবাড়ী মাঠ ময়দান
আকাশ বাতাস মুখরিত দোলযাত্রা।

বিছানার এককোণে শুয়ে আমি
অবাক চোখে আকাশের দিকে চেয়ে থাকি,
আকাশের পূবে পশ্চিমে দিব্যি ফুটে ওঠে
কত রঙে রঙীন প্রজাপতি জলফড়িং,
যেন মাটির কাছ থেকে খানিকটা আবির ধার করে
সারা গায়ে আগুনে রং মেখে
আকাশের প্রান্তরে প্রান্তরে ওরা উড়ে বেড়ায়।
একঝাঁক ইচ্ছে ডানার পাখায় রং লাগিয়ে
সারাটা দুপুর অবাকচোখে আমিও
উড়ে বেড়াই দিগন্তে দিগন্তে প্রজাপতিদের মাঝখানে,
ওরা গুনগুন করে দোলের গান গায়
আমিও দুলে দুলে উড়ে বেড়াই—
লাল, সবুজ, হলুদ, বেগুনী আরও নানা রঙে রাঙানো
জলফড়িং, প্রজাপতিদের পাশে পাশে।

বসন্ত বিদায়

আজও কবিতা লেখার ডায়েরীটা রয়েছে খোলা।
রাত এগিয়ে চলেছে নিজের গতিতে
অবকাশ নেই কারও থেমে থাকার
কলমটা কেবল থমকে দাঁড়িয়ে থাকে প্রতিদিন।

আজও কবিতা লেখার ডায়েরীটা রয়েছে খোলা।
বাসি পলাশের সুবাস এখনো পরিস্কার
আকাশে বাতাসে চারিপাশে,
আবিরে রাঙানো জীবন কালকের দোলের সুরে সুরে
হোলিতে মেতেছিলো আজ
ভারতের প্রান্তরে প্রান্তরে।

আজও কবিতা লেখার ডায়েরীটা রয়েছে খোলা।
কলমের আঁচড়ে কেবলই প্রেম ভালোবাসা,
বিষাদের অশ্রুতে ভিজে আছে মাঠ ঘাট
বসন্ত বিদায়ের সুর মনের একধারে উঁকি মারে—
চোখাচোখি হতে ভয় পায় জানি, তবু
অনিবার্য কালের নিয়মে চলে যাবে শিগগিরি।

আজও কবিতা লেখার ডায়েরী রয়েছে খালি।
মন ভরে আছে বসন্তের প্রেম প্রেম রাগ
আর বিদায়ের অস্তরাগে।

বিকেলবেলা

যদি তোমাদের দলে আজ নাও খেলা
আমি একছুটে ড্রেস পরে তৈরী হয়ে নিতে পারি,
জানলার গরাদের এপারে কয়েদী হয়ে থেকেছি অনেককাল।
প্রতিটি বিকেলে তোমরা জড়ো হও
ঐ কদম গাছের তলায়,
কদমগাছের প্রাণে যেন জল আসে
সারাটা দিনতো আমার মতোই ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে
একটা বিকেলের অপেক্ষায়।
বুড়ি ছোঁয়াছুঁয়ি খেলো তোমরা,
কখনো কাবাডি খেলো,
লুকোচুরি খেলো,
আমি জানালার এপারে বসেও তোমাদের
খেলার সাথী হয়ে যাই
চোখ বুজে লুকিয়ে পড়ি আবার
চোখ খুলেই দেখি কদমগাছটা
আমাকে খুঁজে পাবার আনন্দে প্রাণ খুলে হাসছে।

যদি তোমাদের দলে আজ নাও খেলা
আমি একটা কবিতা লিখতে পারি
আমার নতুন বিকেলের কবিতা
আমার হঠাৎ বেঁচে ওঠার কবিতা।

যদি তোমাদের দলে আজ নাও খেলা
তবে পৃথিবীর চোখরাঙানি এড়িয়ে
একটু বাঁচতে পারি নিজের মতোন।

বন্ধু, একটা গানও শোনাতে পারি
যদি তোমাদের দলে আজ নাও খেলা
ছায়াছায়া বিকেলবেলা।

খোলা রাজপথ

খোলা রাজপথে রাত বারোটায় একা হেঁটে যাচ্ছি
সারাদিনের ক্লান্তি শেষে রাজপথের মুখে মিষ্টি হাসি
কাঁথা কম্বল খুলে রেখে হালকা টেপজামা পড়েছে রাজপথ।
দু একজন আমার মতো রাত্রি শেষের অতিথি এখন রাস্তায়
একটি মাতাল মনের সুখে কাটাকুটি খেলছে রাস্তায়
নিঝুম অন্ধকার রাজপথে একলা মাতাল
কতবার নিজের পায়ে হোঁচট খেয়ে মুখ থুবড়ে
পড়তে পড়তে সামলে নিচ্ছে
প্রতিবারই আমি চমকে উঠছি ওর কাণ্ড দেখে।

খোলা রাজপথে এদিক ওদিক ছড়িয়ে ছিটিয়ে
স্ট্রীট বেগারদের নিশ্চিন্ত বিশ্রাম—
এই রাস্তাই ওদের ঘর, সংসার
বউ বাচ্চা নিয়ে পাশাপাশি শুয়ে নিশ্চিন্ত বিশ্রামে ওরা
আমার থেকে অনেক বেশী শান্তিতে ঘুমোতে যায়
সহায় সম্বলহীন এই পরিবারগুলো।

খোলা রাজপথে একলা উদভ্রান্তের মতো
হেঁটে চলেছি আমি দীর্ঘদিন ধরে।

তুমি এসেছো, বেশ করেছো

যেভাবে হারিয়ে গেছিলে জীবন থেকে,
দিশেহারা উদভ্রান্ত নাবিকের মতো
হাজার হাজার ফুট উঁচু ঢেউয়ের সাথে
সমানে যুদ্ধ করে গেছি দিবারাত্রি,
ঝড় থামার নামই ছিলো না বহুদিন।
আমার জাহাজের সঙ্গীসাথীদের নিয়ে
যে যুদ্ধে নেমেছিলাম, প্রত্যাশা বড় কম ছিলো জীবনের প্রতি।

আজ সমুদ্র শান্ত, মসৃণ পটভূমিতে
শোকের ফসিল পর্যন্ত মাটি খুঁড়ে পাওয়া যাবে না,
যেভাবে হারিয়ে গেছিলে জীবন থেকে
সেভাবেই ফিরে পেয়েছি আবার।
যদি বলি তুমিই সবচেয়ে সুন্দর আমার পাশে
মনে হয় না খুব বেশী বাড়িয়ে বলা হবে।

তুমি ফিরে এসেছো
শীতের হিমেল স্পর্শ ফিরে এসেছে
আমার ঘরের জানালায়,
বসন্ত এসেছে তাড়াতাড়ি, অস্থির পদক্ষেপে
শুঁয়োপোকাগুলো সব মরে গেছে আগে আগে
বদলে অসংখ্য রং বেরঙের প্রজাপতি
ঘুরে বেড়ায় আমার ঘর দোরে, বিছানায়,
চেনা অচেনা রাস্তায়,
আমার দিনে দুপুরে দেখা মরিচীকায়।

তুমি ফিরে এসেছো, বেশ করেছো।

একলা সওয়ার

যখন নদীপথের উৎস খুঁজে খুঁজে হাঁপিয়ে উঠেছি
ঢেউয়ের ধাক্কায় ধাক্কায় আমার নৌকা চূড়ান্ত বেসামাল

যখন পরিস্কার আকাশ আর বিশুদ্ধ অক্সিজেন
আমার শরীরে চোরকাঁটার মতো বিঁধে থাকে

যখন পাখীর কলতানে মুখরিত দিনে
আমি শুকতারার ছবি খুঁজে বেড়াই

যখন ওয়াটার বেডে শুয়ে শুয়ে
একবুক অক্সিজেনের খোঁজে শুধু
পার্থকে আঁকড়ে ধরতে ইচ্ছে করে

যখন নদীপথ খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হেঁটে চলেছি
তবু পায়ের পাতাও ভেজে না

যখন পাড়ের খেয়াঘাট চোখে পড়ে কাছে-দূরে
যাত্রীহীন মাঝিহীন নৌকায় আমি একলা সওয়ার

আমি একলা সওয়ার।

অসম্পূর্ণ কবিতা

সল্টলেকে—
হঠাৎ বিকাশ ভবনের মুখে
এক পশলা বৃষ্টির মতো ঝরে পড়লে
আমার সমুখে,
ঝলসানো রোদের আলোর আভা
আমি স্পষ্ট পড়তে পারছিলাম তোমার চোখে
পড়তে থাকলাম তোমার সমস্ত শরীরে।
সিঁদুরে লাল লাগছিলো তোমার পুরোটা মুখ
সিঁদুরের রং ফিকে মনে হচ্ছিলো থেকে থেকে,
রাগ দুঃখের অভিব্যক্তি যন্ত্রণার মতো
আটকে থাকছিলো গলার পাশে,
শুকনো পাতার থেকেও শুষ্ক বোধ করছিলাম।
চোখের পাতার ওপরে
আটকে পড়া সাদা অভ্রের কণা
তুলে এনে আমার সাজানো বাগানে
পুঁতে ফেলতে চাইছিলাম
এক ঝাঁক পায়রার মতো সাদা গোলাপের নেশায়।

আমি নিশ্চিত
আমার প্রতিটি নড়বড়ে মিনিট
করুণাময়ী মোড়ে তুমি পড়তে পারছিলে,
আতঙ্কের মোড়কে মুড়ে ফেলা দুটি শরীরে
এই না বলা অসংখ্য মিনিট—
করুণাময়ীর মোড়ের সাধারণ জনজীবনে
একটুও উষ্ণতা ছড়ায়নি জানি,
তবু নীরবে পথচলা ঐ কয়েকশো সেকেণ্ড

সাক্ষী হয়ে রইলো
একটি না বলা কবিতার,
সে কবিতার পঙক্তিতে পঙক্তিতে
মনিমুক্তো না পেলেও নুড়ি পাথর অসংখ্য অদৃশ্য,
এ জীবনের প্রতিটি সেকেণ্ডে
ঐ নুড়ি পাথরে মাথা ফাটিয়ে
রক্ত দিয়ে লেখা
এক অসম্পূর্ণ কবিতা।

আমার পেন

পেন আর ছাতা হারানোর রহস্য
এই চল্লিশ বছরের জীবনে
আজ অবধি আমি উদ্ধার করতে পারিনি।

কোনো একটি পেনে আমি দুটি কবিতা লিখিনি
কারণ কোনো একটি পেন
একদিনের বেশী আমার সাথে সংসার করেনি।
বিশ্বাস করুন আমি মিথ্যে বলছি না,
তিন টাকা দামের পেন হোক বা
তিনশো টাকা দামের,
একদিনের তার সংসার।
তিনশো টাকা দামের পেন এই অধম
একবারও কেনেনি বোধ হয়—
দু একবার কোনো শুভাকাঙ্ক্ষীর দৌলতে
হাতে পড়ার সাথে সাথে আমার মন কেঁদে ওঠে,
পেনের হারিয়ে যাবার শোকে নয়
সে শোক আমি রোজ পেয়ে পেয়ে পাথর হয়ে গেছি।
মন কেঁদে ওঠে ঐ মানুষটির জন্যে
যে এত কষ্টের পয়সা জলাঞ্জলি দিয়ে ফেলেছে।
আমি দিনে দশ বিশটা পেনও হারিয়েছি বহুবার।

এ এক অদ্ভুত রহস্য—
এতো পেন আমি কিনি প্রতিদিন?
সেগুলো যায় কোথায়?
ঘরের ভেতরেই তো সেগুলো হারিয়ে ফেলি
এবং কস্মিনকালেও আর খুঁজে পাই না।
অথচ বেশীদিন নয়, গত এক বছরে

কটা পেন হারিয়েছি তা হিসেব করতে ক্যালকুলেটার লাগবে।

এই হাজার হাজার কলম কি তবে
ডানা মেলে উড়ে বেড়ায় ঐ নীল আকাশের বুকে?
যেখানে মাঝে মধ্যে আমি আমার মনের সাথে লুকোচুরি খেলি,
সাইবেরিয়া থেকে শীতের পাখীরা
মাইলের পর মাইল পথ পেরিয়ে
কোনো এক মসৃণ দিঘীর টানে উড়ে চলে—
উড়ে চলার ফাঁকে ফাঁকে
আমি আর আমার মনের সাথে
দুদণ্ড লুকোচুরি খেলে
হাজার ত্রিশ মাইল ওপরের ঐ ঘন নীল আকাশের গভীরে।
যদি একটিও হারিয়ে যাওয়া ডানালাগানো কলম
ধরা পড়ে ঐ আকাশের মাঝে, তবে
আমি ঐ মুহূর্তগুলোর ছবি
ক্যামেরা বন্দী করতে পারি অনন্ত নীল আকাশের প্রেক্ষাপটে।
আকাশের বুকে মেঘের চূড়ায় চূড়ায়
লেখা থাকবে
অতিথি পাখীর সাথে
আমার দুদণ্ড জীবন কাটানোর ইতিহাস।
হারিয়ে ফেলা পেনের গল্প শেষ হলো বটে
ছাতা হারানোর গল্প আরো বড়
তাই পরের কবিতা না হয় লিখব তাকে নিয়ে।

চোরাবালি

চোরাবালি শুধু চোরাবালি
তলিয়ে যাওয়াকেই বলে নিশ্চিন্তে বেঁচে থাকা,
চোরাবালি আছে সর্বত্র—
বিবেকের দংশন কেবল বিবেকের গণ্ডিতে বন্দী
আলো বাতাস জনকোলাহলে তার কোনো পরিচয় নেই
একটি ভুলের মাশুল দিতে হবে
হাজার হাজার মিথ্যের মিনার গড়ে।

চোরাবালি শুধু চোরাবালি
অবক্ষয়ের শতাব্দীতে
একলা বেঁচে থাকি যদি
ধূলি ধূসর মলিন মেঠো পথের পাড়ে,
ক্যাকটাসের সারা গা বেয়ে কান্না ঝরে পড়ে,
সে পথের দুই পাড়ে
চোরাবালি হায়
শুধু চোরাবালি।

সামনে পেছনে তাড়া করে আমায়
নিস্তার নেই,
চোরাবালি শুধু চোরাবালি।

পথ

সামনে যে পথ দেখা যায়
তার ব্যপ্তি অনুমান করা যায়
তার দৈর্ঘ্য প্রস্থ মেপে পা ফেলা যায়
তাকে টপকে ফেলা যায় আপন খেয়ালে।

সে পথে পিছলে পরা যায়
সে পথে স্বপ্নে হাঁটা যায়
সে পথে দৌড়ে ফেরা যায়
সে পথে চেনা মানুষের ভিড়,
সে পথের বাঁকে আছে নতুন এক পথ
যে পথে এই পথিকের পায়ের ছাপ ধরা নেই
যে পথে অচেনা রৌদ্র ছায়া,
সে পথে বন্ধুরা সব পথ হারিয়েছে।

আমিও একলা চলার নেশায়
কানাগলিতে পথ হারাই, তবু খুঁজে ফিরি
কোন পথে সূর্যের আলো আসে
স্যাতস্যাতে পাঁকের গন্ধ চারিপাশে
অচেনা সব পথে আমি একলা হেঁটে বেড়াই
আমার আপন খেয়ালে।

অঙ্গীকার

লিখবো বললেই কি লেখা যায়?
কবিতা লিখতে একটি কাহিনী লাগে
একটি গল্পো লাগে, জীবনের গল্পো।
আনন্দের গল্পো ম্যাড়ম্যাড়ে একঘেয়ে
দুঃখের গল্পো জীবন থেকে নেওয়া
তবু দুঃখের সাথী হওয়া আর হয় না।
যে দুঃখটা আমি দেখেছি
যে উপলব্ধি থেকে কবিতাটি লিখলাম—
সেটি কি ওই দুঃখীর জীবনে
কোনো পরিবর্তন এনেছে?
দুবেলা খেতে না পাওয়া মানুষটাকে কি
একবার পাশে বসিয়ে যত্ন করে খাওয়াতে পেরেছি
নিদেনপক্ষে চেষ্টা করেছি কি একবার?
তাহলে এ কবিতায় শুধু দুঃখের কথা
লিখে কি লাভ?
দুঃখ আছে চারিপাশে
দুঃখের পাশে দাঁড়াবার মানুষ বড়ো কম
কবিতায় দুঃখ লেখা যায়,
কবিতায় দুঃখ পড়া যায়,
যেন দুঃখের পাশে ঢাল হয়ে দাঁড়াবার জন্যে
এ কবিতা পাঠ করা হয়,
একটিবার পাঠক একটি দুঃখের সাথী হবার জন্যে
রাস্তায় নেমে আসুন—
আমাকেও সঙ্গে ডেকে নেবেন
আগাম শুভেচ্ছাসহ আমার ফোন নম্বর রইল
নাইন ডাবল এইট
থ্রি এইট নাইন এইট
থ্রি নাইন এইট।
এ কবিতা একটি জীবনের জন্যে
এ কবিতায় একটি দুঃখের শেষ
আসুন করি অঙ্গীকার।

———